দুই বন্ধু

মহিম বাঁ হাতের কবজি ঘুরিয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিল। বারোটা বাজতে সাত। কোয়ার্টজ ঘড়ি—সময় ভুল হবে না। সে কিছুক্ষণ থেকেই তার বুকের মধ্যে একটা স্পন্দন অনুভব করছে যেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিশ বছর ! আজ হল ১৯৮৯-এর সাতই অক্টোবর। আর সেটা ছিল ১৯৬৯-এর সাতই অক্টোবর। পঁচিশ বছরে এক পুরুষ হয়। তার থেকে মাত্র পাঁচ বছর কম। কথা হচ্ছে—মহিম ত মনে রেখেছে, কিন্তু প্রতুলের মনে আছে কি ? আর দশ মিনিটের মধ্যেই জানা যাবে।

মহিমের দৃষ্টি সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। সে দাঁড়িয়েছে লাইটহাউস বুকিং কাউন্টারের সামনের জায়গাটায়। যাকে বলে লবি। এখানেই প্রতুলের আসার কথা। মহিমের সামনের দরজার কাঠের ভিতর দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ওপারে গলির মুখে একটা বইয়ের দোকানের সামনে জটলা। রাস্তায় চারটে বিভিন্ন রঙ-এর অ্যাম্বাসাডর দাঁড়ানো। আর একটা রিকশা। এবার দরজার ওপরে দৃষ্টি গেল মহিমের। হাতে আঁকা চালু হিন্দি ছবির বিজ্ঞাপন। তাতে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে যার জোরে ছবি হিট করেছে সেই চাড়া-দেওয়া গোঁফওয়ালা ভিলেন কিশোরীলালকে। মহিম অবিশ্যি হিন্দি ছবি দেখে না। আজকাল ভিডিও হওয়াতে সিনেমা দেখাটা একটা ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে গেছে। আর সিনেমা হাউসগুলোর যা অবস্থা ! মহিম তার বাবার কাছে শুনেছে যে এককালে লাইটহাউস ছিল কলকাতার গর্ব। আর আজ ? ভাবলে কান্না পায়।

বুকিং কাউন্টারের সামনে লোকের রাস্তায় আসা যাওয়া দেখতে দেখতে মহিমের মন চলে গেল অতীতে।

তখন মহিমের বয়স পনের, আর প্রতুল তার চেয়ে এক বছরের বড়। সেই বিশেষ দিনটার কথা মহিমের স্পষ্ট মনে আছে। ইস্কুলে টিফিন-টাইম। দুই বন্ধুতে ঘাটের একপাশে জামরুল গাছটার নীচে বসে আলুকাবলি খাচ্ছে। দুজনের ছিল গলায় গলায় ভাব। আর দুজনে ছিল তাদের ক্লাসের সবচেয়ে বড় দুই বিচ্ছু। কোনো মাস্টারকে তারা তোয়াক্কা

করত না। এমন কি অঙ্কের মাস্টার করালিবাবু—যাঁর ভয়ে সারা ইস্কুলের ছাত্ররা তটস্থ—তাঁরা ক্লাসেও মহিম প্রতুলের শয়তানির কোনো কমতি ছিল না। অবিশ্যি করালিবাবুর মতো মাস্টার তা সহ্য করবেন কেন? এমন অনেকদিন হয়েছে যে ক্লাসের সব ছেলে বসে আছে। কেবল মহিম আর প্রতুল বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো। কিন্তু হলে কি হবে?—পরের ক্লাসেই আবার যেই কে সেই।

তবে বিচ্ছু হলেও দুজনেই ছিল বুদ্ধিমান। ফেল করবে এমন ছেলে নয় তারা। সারা বছর ফাঁকি দিয়েও পরীক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে মহিমের স্থান থাকত মাঝামাঝি। আর প্রতুলের নীচের দিকে।

প্রতুলের বাবার রেলওয়েতে বদলির চাকরি। ১৯৬৯-এ তাঁর হুকুম এলো ধানবাদ যাবার। প্রতুলকেও অবিশ্যি বাবার সঙ্গে যেতে হবে, ফলে তার বন্ধুর সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেই নিয়েই দুজনের কথা হচ্ছিল।

'আবার কবে দেখা হবে কে জানে,' বলল প্রতুল। 'কলকাতার পাট একবার তুলে দিলে ছুটি ছাটাতেও এখানে আসার চান্স খুব কম। বরং তুই যদি ধানবাদে আসিস তাহলে দেখা হতে পারে।'

'ধানবাদ আর কে যায় বল?' বলল মহিম। 'বাবা তো ছুটি হলেই হয় পুরী না হয় দার্জিলিং। আজ অবধিও এ নিয়ম পালটায়নি।'

প্রতুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কিছুক্ষণ ঘাসের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুই বড় হয়ে কী করবি ঠিক করেছিস?'

মহিম মাথা নাড়ল। 'সে সব এখন ভাবতে যাব কেন? ঢের সময় আছে। বাবা ত ডাক্তার, উনি অবিশ্যি খুশি হবে যদি আমিও ডাক্তার হই। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই। তুই কিছু ঠিক করেছিস?'

'না।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর প্রতুলই কথাটা পাড়ল—'শোন, একটা ব্যাপার করলে কেমন হয়?'

'কী ব্যাপার?'

'আমরা ত বন্ধু—সেই বন্ধুত্বের একটা পরীক্ষার কথা বলেছিলাম।'

মহিম ভুরু কুঁচকে বলল, 'পরীক্ষা মানে? কী আবোল তাবোল বকছিস?'

'আবোল তাবোল নয়,' বলল প্রতুল। 'আমি গল্পে পড়েছি। এরকম হয়।'

'কী হয়?'

'ছাড়াছাড়ির মুখে দুজন দুজনকে কথা দেয় যে এক বছর পরে অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক জায়গায় আবার মীট করবে।'

মহিম ব্যাপারটা বুঝল। একটু ভেবে বলল, 'ঠিক হ্যায়, আমার আপত্তি নেই। তবে কদিন পরে মীট করব সেই হচ্ছে কথা।'

'ধর, কুড়ি বছর। আজ হল সাতই অক্টোবর ১৯৬৯। আমরা মীট করব সাতই অক্টোবর ১৯৮৯।'

'কখন ?'

'যদি দুপুর বারোটা হয় ?'

'বেশ, কিন্তু কোথায় ?'

'এমন জায়গা হওয়া চাই যেটা আমরা দুজনেই খুব ভালো করে চিনি।'

'সিনেমা হাউস হলে কেমন হয় ? আমরা দুজনেই একসঙ্গে এত ছবি দেখেছি।'

'ভেরি গুড। লাইটহাউস। যেখানে টিকিট বিক্রি করে তার সামনে।'

'তাই কথা রইল।'

দুজনের মধ্যে চুক্তি হয়ে গেল। এই বিশ বছরে কত কী ঘটবে তার ঠিক নেই, কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, মহিম আর প্রতুল মীট করবে যে বছর যে তারিখ যে সময়ে ঠিক হয়েছে, সেই বছর সেই তারিখে সেই সময়ে।

মহিমের সন্দেহ হয়েছিল সে ব্যাপারটা এতদিন মনে রাখতে পারবে কিনা ; কিন্তু আশ্চর্য—এই বিশ বছরে একদিনের জন্যেও সে চুক্তির কথাটা ভোলেনি। প্রতুল চলে যাবার পর—হয়ত বন্ধুর অভাবেই—মহিম ক্রমে বদলে যায়। ভালোর দিকে। ক্লাসে তার আচরণ বদলে যায়, পরীক্ষায় ফল বদলে যায়। সে ক্রমে ভালো ছেলেদের দলে এসে পড়ে। কলেজে থাকতেই সে লিখতে আরম্ভ করেছিল—বাংলায় পদ্য, গল্প, প্রবন্ধ। সে সব ক্রমে পত্রিকায় ছেপে বেরোতে আরম্ভ করে। তার যখন তেইশ বছর বয়স—অর্থাৎ ১৯৭৭-এ—সে তার প্রথম উপন্যাস লেখে। একটি নামকরা প্রকাশক সেটা ছাপে। সমালোচকরা বইটার প্রশংসা করে, সেটা ভালো বিক্রিও হয়। এমন কি শেষ পর্যন্ত একটা সাহিত্য পুরস্কারও পায়। আজ সাহিত্যিক মহলে মহিমের অবাধ গতি, সকলে বলে একালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মহিম চট্টোপাধ্যায়ের স্থান খুবই উঁচুতে।

এই বিশ বছরে প্রথম দিকে কয়েকটা চিঠি ছাড়া প্রতুলের কোনো খবরই পায়নি মহিম। প্রতুল লিখেছিল ধানবাদ গিয়ে তার নতুন বন্ধু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মহিমের জায়গা কেউ নিতে পারেনি। ছ'মাসে গোটা চারেক চিঠি—ব্যস্। তারপরেই বন্ধ। মহিম এতে আশ্চর্য হয়নি। কারণ এইসব ব্যাপারে প্রতুলের মতো কুঁড়ে বড় একটা দেখা যায় না।

চিঠি লিখতে হবে ?—ওরেব্বাবা ! মহিমের অবিশ্যি চিঠি লেখায় আপত্তি ছিল না। কিন্তু এক তরফা তো হয় না ব্যাপারটা।

বারোটা বেজে দু মিনিট। নাঃ—প্রতুল নির্ঘাৎ ভুলে গেছে। আর যদি নাও ভুলে থাকে, সে যদি ভারতবর্ষের অন্য কোনো শহরে থেকে থাকে, তাহলে সেখান থেকে কি করে কলকাতায় ছুটে আসবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে ? তবে এটাও ভাবতে হবে যে কলকাতার ট্র্যাফিকের যা অবস্থা, তাতে প্রতুল কলকাতায় থাকলেও, এবং চুক্তির কথা মনে থাকলেও, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এখানে পৌঁছে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

মহিম ঠিক করল যে আরো দশ মিনিট দেখবে, তারপর বাড়ি ফিরে যাবে। ভাগ্যে আজকে রবিবার পড়ে গেছে। নাহলে তাকে আপিস থেকে কেটে পড়তে হত লাঞ্চের এক ঘন্টা আগে ! উপন্যাস থেকে তার ভালো রোজগার হলেও মহিম সওদাগরী আপিসে তার চাকরিটা ছাড়েনি ! তার বন্ধুও যে নতুন-নতুন হয়নি তা নয়। কিন্তু ইস্কুলের সেই দুষ্টুমি-ভরা দিনগুলোর কথা সে ভুলতে পারেনি।

'শুনছেন ?'

মহিমের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল। সে পাশ ফিরে দেখে একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে তার দিকে চেয়ে আছে, তার হাতে একটি খাম।

'আপনার নাম কি মহিম চ্যাটার্জি ?'

'হ্যাঁ। কেন বলত ?'

'এই চিঠিটা আপনার।'

ছেলেটি খামটা মহিমের হাতে দিল। তারপর 'উত্তর লাগবে' বলে অপেক্ষা করতে লাগল।

মহিম একটু অবাক হয়ে চিঠিটা বার করে পড়ল। সেটা হচ্ছে এই—

'প্রিয় মহিম,

তুমি যদি আমাদের চুক্তির কথা ভুলে না গিয়ে থাক, তাহলে এ চিঠি তুমি পাবে। কলকাতায় থেকেও আমার পক্ষে লাইটহাউসে যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব হল না। সেটা জানানো এবং তার জন্যে মার্জনা চাওয়াই এর উদ্দেশ্য। তবে তোমাকে আমি ভুলিনি। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাও ভুলিনি—এতে আশা করি তুমি খুশি হবে। 'ইচ্ছা আছে একবার তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি। 'তুমি এই চিঠিরই পিছনে যদি তোমার ঠিকানা, এবং কোন সময়ে গেলে

তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সেটা লিখে দাও। তাহলে খুব খুশি হব।

শুভেচ্ছা নিও। ইতি

তোমার বন্ধু প্রতুল

মহিমের পকেটে কলম ছিল। সে চিঠিটার পিছনে তার ঠিকানা এবং আগামী রবিবার সকাল ন'টা থেকে বারোটা সময় দিয়ে চিঠিটা ছেলেটিকে ফেরত দিল। ছেলেটি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মহিমের আর এখানে থাকার দরকার নেই, তাই সে বাইরে বেরিয়ে এসে হুমায়ুন কোর্টে রাখা তার সদ্য-কেনা নীল অ্যাম্বাসাডারটার দিকে এগিয়ে গেল। প্রতুল ভোলেনি এটাই হল বড় কথা। কিন্তু রবিবার, তাও সে কলকাতায় থেকে কেন লাইটহাউসে আসতে পারল না সেটা মহিমের কাছে ভারি রহস্যজনক বলে মনে হল। তার সঙ্গে যে মহিম যোগাযোগ করবে সে উপায়ও নেই, কারণ চিঠিতে কোনো ঠিকানা ছিল না। ছেলেটিকে জিগ্যেস করলে হয়ত জানা যেত, কিন্তু সেটা তখন মহিম খেয়াল করেনি। চিঠিটা খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া কাগজে। তাহলে কি প্রতুলের এখন দৈন্যদশা ? তার অবস্থাটা সে তার বন্ধুকে জানতে দিতে চায় না ? কিন্তু সে ত মহিমের বাড়িতে আসতে চেয়েছে। এলে পরে সব কিছু জানা যাবে।

বাড়ি ফিরতে স্ত্রী শুভ্রা জিগ্যেস করল, 'কী, দেখা হল বন্ধুর সঙ্গে ?'

'উঁহু। তবে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল একটি ছেলের হাতে। সে যে মনে রেখেছে এটাই বড় কথা। এ জিনিস যে সম্ভব সেটা এ ঘটনা না ঘটলে বিশ্বাস করতাম না। যখন চুক্তিটা করেছিলাম তখনও বিশ্বাস করিনি যে দুজনেই এটার কথা মনে রাখতে পারব।'

পরের রবিবার, সকাল দশটা নাগাদ মহিম বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। এমন সময় দরজায় রিং হল। চাকর পশুপতি গিয়ে দরজা খুলল। 'বাবু আছেন ?' প্রশ্ন এল মহিমের কানে। চাকর হ্যাঁ বলতে দরজা দিয়ে একটি ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে এলেন। তাঁর মুখে হাসি। ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়ানো। মহিমও তার ডান হাতটা বাড়িয়ে ভদ্রলোকের হাতটা শক্ত করে ধরে অবাক হাসি হেসে বলল, 'কী ব্যাপার প্রতুল ? তুই দেখছি শুধু গতরে বেড়েছিস—চেহারা একটুও পালটায়নি। বোস, বোস।'

প্রতুলের মুখ থেকে হাসি যায়নি, সে পাশের সোফায় বসে বলল, 'বন্ধুত্বের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে ?'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল মহিম, 'আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছি।'

'তুই ত লিখিস, তাই না ?'

'হ্যাঁ—তা লিখি।'

'একটা পুরস্কারও ত পেলি। কাগজে দেখলাম।'

'কিন্তু তোর কী খবর? আমার ব্যাপার ত দেখছি তুই মোটামুটি জানিস।'

প্রতুল একটুক্ষণ মহিমের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমারও চলে যাচ্ছে।'

'কলকাতাতেই থাকিস নাকি?'

'সব সময় না। একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়।'

'ট্র্যাভেলিং সেলসম্যান?'

প্রতুল শুধু মৃদু হাসল, কিছু বলল না।

'কিন্তু একটা কথা ত জানাই হয়নি,' বলল মহিম।

'কী?'

'সেদিন তুই ব্যাটাচ্ছেলে এলি না কেন? কারণটা কী? অন্য লোকের হাতে চিঠি পাঠালি কেন?'

'আমার একটু অসুবিধা ছিল।'

'কী অসুবিধা? খুলে বল না বাবা!'

কথাটা বলতে বলতেই মহিমের দৃষ্টি জানালার দিকে চলে গেল। বাইরে গোলমাল। অনেক ছেলে ছোকরা কেন জানি এক সঙ্গে হল্লা করছে।

মহিম একটু বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে জানালার পর্দা ফাঁক করে অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'ওই গাড়ি কি তোর?'

এতবড় গাড়ি মহিম কলকাতায় দেখেছে বলে মনে পড়ল না।

'আর এইসব ছেলেরা হল্লা করছে কেন?' মহিমের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

এবার বন্ধুর দিকে ফিরে মহিমের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

প্রতুল নাকের নীচে এক জোড়া চাড়া দেওয়া পুরু গোঁফ লাগিয়ে তার দিকে চেয়ে মিটমিট হাসছে।

'কিশোরীলাল!' মহিম প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

প্রতুল গোঁফ খুলে পকেটে রেখে বলল, 'এখন বুঝতে পারছিস ত কেন লাইটহাউসে যেতে পারিনি? খ্যাতির বিড়ম্বনা। রাস্তাঘাটে বেরোন অসম্ভব।'

'মাই গড।'

প্রতুল উঠে পড়ল।

'বেশিক্ষণ থাকলে আর ভিড় সামলানো যাবে না। আমি কাটি। আমার ছবি একটাও দেখিসনি ত?'

'তা দেখিনি।'

'একটা অন্তত দেখিস। লাইটহাউসের দুটো টিকিট পাঠিয়ে দেব।'

প্রতুল বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল—মহিম তার পিছনে।

দরজা খুলতে একটা বিরাট হর্ষধ্বনির সঙ্গে 'কিশোরীলাল! কিশোরীলাল!' চিৎকার শুরু হয়ে গেল। প্রতুল কোনোরকমে জনস্রোতের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও রওনা দিয়ে দিল। মহিম দেখল প্রতুল তার দিকে হাত নাড়ছে। মহিমের হাতটা ওপরে উঠে গেল।

ভিড় থেকে একটা ছেলে মহিমের দিকে এগিয়ে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, 'কিশোরীলাল আপনার বন্ধু।'

'হ্যাঁ ভাই, আমার বন্ধু।'

মহিম বুঝল এবার থেকে পাড়ায় তার আসল নাম মুছে গিয়ে তার জায়গায় নতুন নাম হবে—'কিশোরীলালের বন্ধু।'